প্রথম আলো

কলাম

বিশ্লেষণ

স্কুলে স্মার্টফোন ব্যবহারের সুস্পষ্ট নীতিমালা কেন করা দরকার

প্রশ্নপত্র একটু কঠিন হলেই আপত্তি, পরীক্ষার হলে কড়াকড়ি হলেই অসন্তোষ, নকল ঠেকাতে ব্যবস্থা নিলেই আন্দোলনের ডাক—এগুলোকে শুধু বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এগুলো আমাদের সমাজে তৈরি হওয়া একটি বড় মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। লিখেছেন মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার

জালালউদ্দিন শিকদার

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক

আপডেট: ২০ জুলাই ২০২৬, ১৭: ২৬

২০০৪ সালে প্রথমবারের মতো ইংল্যান্ডে পড়তে গিয়েছিলাম। একদিন ট্রেনে বসে একটি স্থানীয় পত্রিকায় পড়লাম, কয়েকটি স্কুলে শিক্ষার্থীদের পোশাক ও মুঠোফোন ব্যবহার নিয়ে নতুন নিয়ম চালু হচ্ছে। অবাক হয়ে ভাবলাম, যে সমাজ ব্যক্তিস্বাধীনতার কথা এত জোর দিয়ে বলে, তারা আবার শিশুদের জন্য এত কড়াকড়ি করছে কেন?

কয়েক বছর পর অস্ট্রেলিয়ায় পড়তে গেলাম। পড়াশোনার পাশাপাশি একটি দোকানে কাজ করতাম। প্রতিদিন সিগারেটের প্যাকেট বিক্রি করতে হতো। প্যাকেটজুড়ে থাকত ক্যানসারে আক্রান্ত মানুষের ছবি, নষ্ট হয়ে যাওয়া ফুসফুস কিংবা ক্ষতবিক্ষত গলার দৃশ্য। প্রথমে বিষয়টি অদ্ভুত লাগত। পরে বুঝলাম, এটি সিগারেটের বিরুদ্ধে নয়; আসক্তির বিরুদ্ধে লড়াই। নতুন প্রজন্মকে শুরুতেই সতর্ক করা গেলে ভবিষ্যতের ক্ষতি অনেকটাই কমানো সম্ভব।

সময় এগিয়ে গেছে। আমার দুই সন্তান এখন স্কুলে পড়ে। স্কুল তাদের জন্য আলাদা ডিজিটাল অ্যাকাউন্ট দিয়েছে। কিন্তু সেটি পুরোপুরি তাদের নিয়ন্ত্রণে নয়। অভিভাবক হিসেবে আমরাও দেখতে পারি তারা কী ব্যবহার করছে, কী ধরনের ভিডিও দেখছে। ইউটিউবেও বয়সভিত্তিক নিরাপত্তাব্যবস্থা রয়েছে। পরে বুঝেছি, এটি অবিশ্বাস নয়; দায়িত্ব। যেমন ১০ বছরের একটি শিশুর হাতে গাড়ির চাবি তুলে দেওয়া যায় না, তেমনি সীমাহীন ডিজিটাল স্বাধীনতাও তার জন্য নিরাপদ নয়।

ঠিক তখনই আগের সেই ছোট্ট সংবাদটির কথা আবার মনে পড়ল। ইংল্যান্ডের স্কুল, অস্ট্রেলিয়ার সিগারেটের প্যাকেট আর আজকের ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ—সব যেন একসুতায় গাঁথা। তখন নিজের কাছেই একটি প্রশ্ন করলাম, যারা এই ডিজিটাল পৃথিবী তৈরি করেছে, তারাই কেন নিজেদের সন্তানদের জন্য একের পর এক সীমারেখা টেনে দিচ্ছে?

উন্নত দেশগুলো হঠাৎ এত চিন্তিত কেন?

শিশু-কিশোরদের ডিজিটাল জীবন নিয়ে গত এক দশকে অনেক গবেষণা হয়েছে। নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক মনোবিজ্ঞানী জোনাথন হাইট তাঁর আলোচিত বই *দ্য অ্যাঙ্কশাস জেনারেশন*-এ দেখিয়েছেন, গত দুই দশকে শিশুদের শৈশব ধীরে ধীরে খেলার মাঠ থেকে মুঠোফোনের পর্দায় চলে গেছে। এর ফলে তাদের মনোযোগ, মানসিক স্বাস্থ্য ও সামাজিক বিকাশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

একই ধরনের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন মার্কিন মনোবিজ্ঞানী জিন টুয়েঞ্জ। তিনি তাঁর বই *আইজেন* ও পরবর্তী গবেষণায় দেখিয়েছেন, স্মার্টফোননির্ভর জীবন শিশু-কিশোরদের আচরণ ও মানসিক স্বাস্থ্যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। একই সতর্কবার্তা দিয়েছে ইউনিসেফের ‘চাইল্ডহুড ইন আ ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড’ প্রতিবেদনও। সেখানে বলা হয়েছে, অনিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল ব্যবহার শিশুদের ঘুম, শেখার ক্ষমতা, মানসিক সুস্থতা ও সামাজিক বিকাশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ।

এই উদ্বেগ থেকেই বিশ্বের অনেক দেশ নীতিগত পদক্ষেপ নিচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া ২০২৪ সালে আইন পাস করে ১৬ বছরের কম বয়সীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে বয়সসীমা নির্ধারণ করেছে (শিশুদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিষিদ্ধ করে অস্ট্রেলিয়ায় প্রস্তাব পাস, ২৯ নভেম্বর ২০২৪)। যুক্তরাজ্যও স্কুলে স্মার্টফোন ব্যবহার নিয়ে নতুন নির্দেশনা দিয়েছে (মোবাইল ফোনস ইন স্কুলস: গাইডেন্স ফর স্কুলস, যুক্তরাজ্যের শিক্ষা বিভাগ, ২০২৪)।

ফ্রান্স ২০১৮ সালেই স্কুলে মুঠোফোন নিষিদ্ধ করেছিল। এর ধারাবাহিকতায় প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৫ বছরের কম বয়সীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। নেদারল্যান্ডস, ইতালিসহ আরও কয়েকটি ইউরোপীয় দেশও শ্রেণিকক্ষে স্মার্টফোন ব্যবহারে কড়াকড়ি করেছে।

ওপরের উদাহরণ থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট; দেশভেদে নিয়ম হয়তো কিছুটা আলাদা, কিন্তু লক্ষ্য একটাই—শিশুদের জন্য নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ নিশ্চিত করা। তাই প্রশ্নটি শুধু অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড বা ফ্রান্সের নয়; প্রশ্নটি আমাদেরও। তাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কী শিখব?

ফেসবুক, ইউটিউব বা টিকটক কি শুধুই বিনোদন?

আমরা অনেকেই মনে করি টিকটক, ফেসবুক রিলস বা ইউটিউব শর্টস তো শুধু বিনোদনের মাধ্যম। কয়েক মিনিট দেখলাম, তারপর রেখে দিলাম। কিন্তু বাস্তবতা কি এত সহজ?

ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলো শুধু ভিডিও দেখানোর জন্য তৈরি হয়নি; এগুলো তৈরি হয়েছে আমাদের যত বেশি সময় সম্ভব পর্দার সামনে ধরে রাখার জন্য। প্রযুক্তিবিশ্বের ভাষায় একে বলা হয় 'অ্যাটেনশন ইকোনমি' অর্থাৎ আপনি যত বেশি সময় একটি প্ল্যাটফর্মে থাকবেন, তত বেশি বিজ্ঞাপন দেখবেন, আর সেই প্রতিষ্ঠানের আয়ও তত বাড়বে।

এ কারণেই এসব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অ্যালগরিদম এমনভাবে কাজ করে, যাতে একটি ভিডিও শেষ হওয়ার আগেই আরেকটি ভিডিও সামনে চলে আসে। আপনি থামতে চাইলে প্ল্যাটফর্মটি চায় আপনি আরও কিছুক্ষণ থাকুন। কয়েক মিনিটের জন্য ফোন হাতে নিলেও কখন যে এক ঘণ্টা কেটে যায়। প্রাপ্তবয়স্ক একজন মানুষই যদি এই অ্যালগরিদমের প্রভাব পুরোপুরি এড়াতে না পারেন, তাহলে ১২, ১৪ বা ১৬ বছরের একটি শিশুর পক্ষে তা কতটা কঠিন, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

তাই প্রশ্নটি টিকটক, ফেসবুক বা ইউটিউব থেকে দূরে থাকা নয়; প্রশ্ন হলো একটি শিশু কখন, কতক্ষণ এবং কী উদ্দেশ্যে এসব মাধ্যম ব্যবহার করবে? সেই সিদ্ধান্ত কে নেবে, অ্যালগরিদম, নাকি পরিবার, স্কুল ও রাষ্ট্র?

আমরা কি পরিশ্রমের সংস্কৃতি হারিয়ে ফেলছি?

এতক্ষণ প্রযুক্তি নিয়ে যে আলোচনা করলাম, সেটি শুধু মুঠোফোন বা টিকটকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এর প্রভাব ধীরে ধীরে আমাদের শিক্ষা, চিন্তাভাবনা ও সামাজিক আচরণেও পড়ছে। সাম্প্রতিক এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষা ঘিরে যে আলোচনা হয়েছে, সেটিও সেই পরিবর্তনের একটি উদাহরণ। প্রশ্নপত্র একটু কঠিন হলেই আপত্তি, পরীক্ষার হলে কড়াকড়ি হলেই অসন্তোষ, নকল ঠেকাতে ব্যবস্থা নিলেই আন্দোলনের ডাক—এগুলোকে শুধু বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখলে ভুল হবে। এগুলো আমাদের সমাজে তৈরি হওয়া একটি বড় মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়।

তবে এখানে শিক্ষার্থীদের দোষ দেওয়া উচিত হবে না। তারা যে পরিবেশে বড় হয়েছে, সেই পরিবেশই তাদের ভাবনা ও প্রত্যাশাকে গড়ে তুলেছে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা এমন একটি সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে গেছি, যেখানে অনেক সময়ই মেধা ও অধ্যবসায়ের চেয়ে সহজ সাফল্যকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস, গণহারে জিপিএ-৫, 'অটো পাস' কিংবা যেকোনোভাবে সবাইকে খুশি রাখার প্রবণতা—এসবের প্রভাব দ্রুত শেষ হয় না। একটি প্রজন্মের চিন্তায় তার দীর্ঘ ছাপ থেকে যায়।

স্কুলে স্মার্টফোন ব্যবহারের সুস্পষ্ট নীতিমালা, অভিভাবকদের জন্য ডিজিটাল সচেতনতা কর্মসূচি, শিশুদের উপযোগী অনলাইন নিরাপত্তাব্যবস্থা, প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর

জবাবদিহি এবং বয়সভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের নীতি—এসব নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা শুরু হওয়া দরকার।

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নতুন সংস্কৃতি। এখানে ধৈর্যের চেয়ে গতি, গভীর জ্ঞানের চেয়ে ভাইরাল হওয়া আর দীর্ঘ প্রস্তুতির চেয়ে তাৎক্ষণিক জনপ্রিয়তা অনেক বেশি আকর্ষণীয়। ফলে অল্প বয়স থেকেই অনেকের মনে এমন ধারণা তৈরি হয় যে কঠিন পথের চেয়ে শর্টকাটই যেন সাফল্যের সহজ উপায়।

এ কারণেই যখন পরীক্ষার প্রশ্ন উন্নত করা হয়, নকল বন্ধ করা বা মূল্যায়ন আরও কঠোর করার চেষ্টা হয়, তখন সেটি অনেকের কাছে অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। অথচ একটি দেশের ভবিষ্যৎ গড়তে হলে পরীক্ষায় সততা, মূল্যায়নে ন্যায়বিচার এবং পরিশ্রমের মূল্য—তিনটির কোনো বিকল্প নেই।

অনেকে বলেন, আগে শিক্ষাব্যবস্থা পুরোপুরি ঠিক করা হোক, তারপর মানসম্মত পরীক্ষা নেওয়া হোক। শুনতে কথাটি যুক্তিসংগত মনে হলেও বাস্তবে বিশ্বের কোনো দেশ এভাবে এগোয়নি। শিক্ষা সংস্কার একটি চলমান প্রক্রিয়া। উন্নত দেশগুলো একদিকে পাঠ্যক্রম, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ ও শিক্ষণপদ্ধতির উন্নয়ন করে, অন্যদিকে একই সঙ্গে প্রশ্নপত্র, পরীক্ষা এবং মূল্যায়নের মানও উন্নত করে। দুটি কাজই পাশাপাশি চলে।

কোনো দেশের শিক্ষা সংস্কার এক দিনে শেষ হয় না। নতুন নীতি চালু হয়, তার ফলাফল দেখা হয়, গবেষণা করা হয়, কোথায় দুর্বলতা আছে, তা চিহ্নিত করা হয়। তারপর আবার সংশোধন করা হয়। এভাবেই ধীরে ধীরে একটি শক্তিশালী শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠে। তাই সব সমস্যা সমাধানের অপেক্ষায় পরীক্ষার মান কমিয়ে রাখা বা যথাযথভাবে মূল্যায়ন বন্ধ রাখা কখনোই দীর্ঘমেয়াদি সমাধান হতে পারে না; বরং শিক্ষা ও মূল্যায়ন—দুটির মানই একসঙ্গে উন্নত করতে হবে।

প্রতীকী ছবি

আরও একটি বিষয় আমাদের ভাবতে হবে। সন্তান শুধু পাঠ্যবই থেকে শেখে না। সে শেখে পরিবার থেকে, সমাজ থেকে এবং রাষ্ট্রের আচরণ থেকেও। যদি সে বারবার দেখে যে কষ্ট না করেও সফল হওয়া যায়, তাহলে একসময় সেটিই তার কাছে স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। আবার যদি দেখে সততা, দক্ষতা ও অধ্যবসায়ের মূল্য আছে, তাহলে সেও সেই পথেই হাঁটতে শেখে।

যে সমাজে পরিশ্রমের চেয়ে 'শর্টকাটে উন্নতি' বেশি জনপ্রিয় হয়ে যায়, সেখানে শুধু পরীক্ষার মান নয়, একসময় মানুষের মানও কমতে শুরু করে। তাই আমাদের সামনে প্রশ্ন শুধু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম বা স্মার্টফোনের ব্যবহার নয়; প্রশ্ন হলো, আমরা কি এমন একটি প্রজন্ম গড়ে তুলছি, যারা কঠিন কাজকে এড়িয়ে যেতে চায়, নাকি এমন একটি প্রজন্ম, যারা চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে শেখে, ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা নেয় এবং পরিশ্রমের মধ্যেই ভবিষ্যতের সাফল্য খুঁজে পায়?

সরকার কি কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস দেখাবে?

শিশুদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলতে গেলে শুধু পরিবার বা শিক্ষকদের দিকে তাকালে হবে না। এখানে রাষ্ট্রেরও বড় দায়িত্ব রয়েছে। কারণ, কোনো সমাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে সেই সমাজ শিশু-কিশোরদের জন্য কী ধরনের পরিবেশ তৈরি করছে তার ওপর।

এটি নতুন কোনো ধারণা নয়। ইতিহাস বলছে, উন্নত দেশগুলো ‘জনতুষ্টিবাদী’ সিদ্ধান্ত নয়, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাহস দেখিয়েছে। ধূমপান নিয়ন্ত্রণ, সিটবেল্ট বাধ্যতামূলক করা, হেলমেট ব্যবহার, শিশুশ্রম বন্ধ করা কিংবা মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানোর বিরুদ্ধে কঠোর আইন—শুরুতে এসব সিদ্ধান্তের অনেক বিরোধিতা হয়েছিল। কিন্তু সময়ই প্রমাণ করেছে, জনস্বার্থে নেওয়া কঠিন সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে বেশি মানুষের উপকার করেছে।

আজ ডিজিটাল প্রযুক্তির ক্ষেত্রেও আমরা ঠিক একই ধরনের একটি সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। প্রশ্ন হলো শিশু-কিশোরদের জন্য বয়সভিত্তিক ডিজিটাল নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা কি সাহসী সিদ্ধান্ত নিতে প্রস্তুত?

এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার করা জরুরি। স্মার্টফোন নিষিদ্ধ করা সমাধান নয়। প্রযুক্তিকে ভয় পাওয়ারও কোনো কারণ নেই। বরং প্রয়োজন এমন একটি নীতি, যেখানে শিশুর বয়স, মানসিক বিকাশ এবং শেখার প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। উন্নত বিশ্বে যে শিশুর জন্য সাইকেল চালাতে হেলমেট বাধ্যতামূলক করা হয়, তার জন্য ডিজিটাল নিরাপত্তার নিয়ম থাকাও অস্বাভাবিক নয়।

বাংলাদেশেও এখন সময় এসেছে বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তাভাবনা করার। স্কুলে স্মার্টফোন ব্যবহারের সুস্পষ্ট নীতিমালা, অভিভাবকদের জন্য ডিজিটাল সচেতনতা কর্মসূচি, শিশুদের উপযোগী অনলাইন নিরাপত্তাব্যবস্থা, প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোর জবাবদিহি এবং বয়সভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের নীতি—এসব নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে আলোচনা শুরু হওয়া দরকার।

এটি আপাতদৃষ্টিতে কোনো রাজনৈতিক বিষয় নয়। এটি ভবিষ্যতে প্রজন্মের বিষয়। আজ যে সিদ্ধান্ত আমরা নেব, তার প্রভাব হয়তো আগামী ২০ বা ৩০ বছর ধরে বাংলাদেশ বহন করবে। প্রশ্ন একটাই—আমরা কি অপেক্ষা করব, নাকি সময় থাকতেই সিদ্ধান্ত নেব?

- **মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন শিকদার** শিক্ষক ও গবেষক, রাষ্ট্র ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়

- *মতামত লেখকের নিজস্ব*

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৬ প্রথম আলো